Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩১ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই কার্ত্তিক, ১৪২৯ / 24.10.2022

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভারতের বেদপূর্ব ও বৈদিক সমাজ	শ্রী সত্যেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
মহাকবি কালিদাসের অধ্যাত্ম ভাবনা	শ্রী রমেন রায়
মৃত্যুভয় - The Fear of Death	শ্রীঅরবিন্দ
শ্মশানবাসিনী শ্যামা	শ্রী শান্তশীল দাশ
গর্ভধারিনী	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
রক্তের দাগ	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

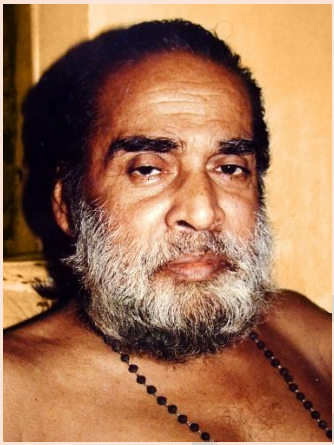

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"ঈশ্বরের প্রসাদ যখনই খাবে, তখনই চিন্তা করবে এই প্রসাদ ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হয়েছে ও তাঁর প্রভাব এর ভিতর বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং এই প্রসাদ খেয়ে আমার অন্তর মহৎ হোক ও মহৎ প্রভাব আমার ভিতর জাগ্রত হোক। আমার দেহ সুস্থ হোক, অন্তর আনন্দময় হোক।"

DO NOT COPY

(১৫.১০.১৯৩৬ – ২৪.১০.২০১৯)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

দুর্গাপুজো কেটে গেল। আবার এলো সেই অগ্রহায়ণ মাস। এই ২৪শে নভেম্বর বিকেলে শ্রীপ্রীতিকুমার আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেলেন। রেখে গেলেন অসংখ্য স্মৃতি, অগণিত ভক্তবৃন্দ ও অসহায় আমাদের।

গত আগস্ট, '৮৯ থেকেই আমি কলকাতার বাইরে থাকছি। অমরনাথ যাত্রায় কেটে গেল ১৫ দিন। তারপর ফিরে N.C.C. Camp । আবার গেছিলাম বারাণসী ও লক্ষ্ণৌতে। মোটামুটি কালীপুজোর দু'দিন আগে একটু স্থিতু হতে চলেছি। তবে সামনে আবার বড়দিনের ছুটি। এখনই মনে হচ্ছে হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে .....।

মাঝে মাঝে বাইরে না গেলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শ্রীপ্রীতিকুমার "My familiar" গোছের এমন কিছু family রেখে গেছেন যাঁদের হাত থেকে আমি সদাই নিষ্কৃতি খুঁজি। পার্থসারথিতে আমার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ ১৯৮৬-র নভেম্বর মাস থেকে। তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আমি বিভিন্নভাবে আমাদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেছি। দরজার সামনে বিজ্ঞপ্তি লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তবু সেই একই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। হয় তারা পার্থসারথিতে আমার লেখা মন দিয়ে পড়েন না, নয়তো গ্রাহ্য করেন না, অথবা জেনে শুনে "---" সেজে থাকেন।

এবার আমার একটি আবেদন আছে। যারা শ্রীপ্রীতিকুমারকে ভালবেসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এখানে আসেন, তাঁরা আমাদের অতি আদরনীয় ও সম্মানের। কিন্তু যাঁরা সারা বছর খোঁজ খবর নেন না, হঠাৎ এসে উদিত হন, তাঁরা আসুন, কথাবার্তা বলুন, গল্প করুন। হঠাৎ এসে কে এখানে আসে যায়, কে কি বলে, কার সাথে কি সম্পর্ক, মামলার কতদূর, বাপী কি করবে ... ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন করবেন না। আমরা দিনের পর দিন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি। আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁদের মঙ্গলের জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সময় দিয়েছেন। সে সুখ তারা ভোগও করেছেন। এখন আমাদের আর কিছু করবার নেই। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

শ্রীপ্রীতিকুমার অন্যের রান্নাঘরে ঢোকা ভীষণ অপছন্দ করতেন। বিশেষ করে এ বাড়িতে এসে মীরা বা গীতাদি ছাড়া আর কাউকে allow করতেন না রান্নাঘরে যেতে। বরানগরে শ্রীলা মাঝে মাঝে দু' একপদ special রান্না করেছে, কিন্তু এখানেও শ্রীলা বেশী আসেই নি। চিত্রাও অনেক পরে এসেছে। কিন্তু অন্য অনেকে আমাকে overtake করে কাপ ধোওয়ার নাম করে রান্নাঘরে ঢুকে যান যখন, তখন মনঃপূত না হলেও ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে থাকতে খুব অসুবিধা হয় আমার। আমি মনে করি আমার গণ্ডীতে আমিই কাজ করি।

বারবার জিজ্ঞেস করতেন, "কি ব্যাপার বলো তো? সকলে এসে এক জায়গায় বসে না কেন? এদিকে ওদিকে চলে যায় কেনো?" আমার মনে হয় তাঁর এই অপছন্দের ব্যাপারটা আমাদের শোনাই ভালো।

তাঁর উপস্থিতিতে আমি অনেককে দেখেছি যে, কোনও ঘরে ঢুকে তার মাপজোক করতে। ফার্নিচার বেশি বলে দুঃখ প্রকাশ করতে। তাঁরা চলে গেলে শ্রীপ্রীতিকুমার খুব রহস্য করে তাঁদের গলা হুবহু নকল করে সেই বাক্যগুলি হুবহু উচ্চারণ করতেন।

তিনি সশরীরে সবাইকে আজ আর দেখা দেন না। কিন্তু এখন আর আমার দুরবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাকে বলব? পুরনো ফ্রিজ গত বছরে খারাপ হয়ে গেল। নীরেনদা ছাড়া উপায় নেই। তাঁকেই উপদেষ্টা হিসাবে মানি। একটি hotel size-এর ফ্রিজ নিয়ে এলাম নীরেনদার বন্দোবস্তে। সে আনা আমার কাল হোল। লোকজন অবিরত আসছেন। আমার চোখের সামনে দরজা

টেনে খোলা হচ্ছে। "কত দাম?" "কোথা থেকে কিনলেন?" "এত বড় ফ্রিজ কি হবে?" "সাদা নিলেন কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি .....। last-এ মন্তব্য, "আপনি খুব বড়লোক তো!"

এখন কিছু কিনতেই আমার ভয় করে। বাড়িতে মিস্ত্রী লাগাতে ভয় করে। আমার যে এত হিতৈষী ছিলেন তা আমার জানা ছিল না এবং তারা যে আমাকে ভিখারী ভেবেছিলেন তাও জানা ছিল না। সময় খারাপ গেলে সবই খারাপ হয়!

অথচ এই শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ কি ভীষণ মার্জিত, ভদ্র ছিলেন, চিন্তা করা যায় না। কেউ কিছু কিনলে তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যেতো। খুশী হয়ে বলতেন, "বাঃ! খুব সুন্দর হয়েছে।" কখনও দাম জিজ্ঞেস করেন নি, কখনও জানতে চান নি কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছে। এমনি ছিল তাঁর শিষ্টাচার। অথচ এত বছর তাঁর সংস্পর্শে থেকেও আমরা কেন, কবে, কত, কোথায় ... প্রশ্ন করতে দ্বিধা বোধ করি না।

আমার মনে পড়ে না কোথাও গিয়ে আমি সেই জায়গা ছেড়ে আর অন্য ঘরে বসেছি। এমনি ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের শিক্ষা। বলতেন, "কখনও কৌতূহল প্রকাশ করবে না। কোনও জিনিষ দেখে অবাক হবে না।" সেটা মেনে চলবার চেষ্টা করি। অথচ গত তিন বছরে দেখছি বাপীর টেবিলের কাগজপত্রগুলোও কেউ কেউ উলটে পালটে দেখেন। আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে। কিন্তু বলেছিলেন, "বাড়ীর উপরে শত্রুকেও কিছু বলতে নেই।" তাই চুপ করে থাকবার চেষ্টা করি।

নিজে চলে যাবেন তার প্রস্তুতি চলছিল কিছুদিন ধরেই। তিনি প্রয়াত হবার পর পরই বাপী বারাসাতের বাড়ীর আলমারি খুলে সামনেই একটি ডায়েরি পায়। তাতে ১০টি নির্দেশ ছিল। আমার সেই Ten Commandments এর কথা মনে পড়ে যায়। অথচ তিনি থাকতেই বাপী বেশ কিছুদিন লোকাভাবে বারাসাতের বাড়ীতে ছিল। তখন কিন্তু তার চোখে ডায়েরীটি পড়েনি। তখন পেলে লেখার কারণ জিজ্ঞেস করতাম।

শ্রীপ্রীতিকুমার দমদমের বাড়ীতে এসে আমার রান্নাঘরটি একটু বড় দেখে খুশী হয়েছিলেন। বরানগরের বাড়ীতে আমি ছোট্ট রান্নাঘরে সোজাভাবে কুড়ি বছর বসে রান্না করতে পারিনি। তারজন্য আমার খুব দুঃখ ছিল। এখানে এসে

নিজে Glazed tiles বসিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, Marble slab বসিয়ে দেবেন। সে সময় সেটা হয়ে ওঠেনি। পরে আমি আদিত্য মার্বেলস-এর দুলালের সহায়তায় রান্নাঘরে slab-টা ধীরে ধীরে বসাবার ব্যবস্থা করি। সে আমার আর এক পেট ব্যথা। কেউ এলে আমার বুক ধড়ফড় করে অঠে, এই বুঝি রান্নাঘরে চলে যায় কেউ, এই বুঝি জ্ঞানের কথা শুনতে হয়। এই বুঝি আবার দাম, মাপ ব্যাখ্যা করতে হয়। কেউ এলে পারতপক্ষে রান্নাঘরে ঢুকি না। ও বাব্বাঃ! কাপ ধোবার নাম করে ঠিক চলে যাবে। আমি গুরুপত্নী! আমার হাতে কাপ দেওয়া যায় না। বারবার হাত বাড়াই, গ্রাহ্যই করে না। ... আর কি বলব? এই ত আমার দুরবস্থা! মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে-- "ওগো, তোমার পোষ্যগুলিকে আমার ঘাড় থেকে কবে সরাবে? আমি যে ইচ্ছেমত থাকতে পারছি না।" ফটোর দিকে তাকালে সেই মুচকী হাসি। যেন বলছেন, "কেমন মজা? বুঝতে পারছো আমি না থাকলে কি হয়? বলেছিলাম না হাড়ে হাড়ে বুঝবে?"

এবার কালীপূজার পরদিন শ্যামবাজার যাব ভেবেছিলাম, যাওয়া হয়নি। গত ত্রিশ বছর ধরে প্রতিপদে তাঁর পছন্দের খাবার করে নিয়ে যেতাম। এবার বাড়িতে দিলাম। সকালে মনে হল বললেন, "আমি একা থাকব?" যেতে পারলাম না। কোথাও গিয়ে আমার ভাল লাগে না, মনে হয় কখন খাবার দেব, চা দেব? দেরি হয়ে যাবে! এ যেন আমার গোপাল সেবা হচ্ছে। কিন্তু তবু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। যেদিন থাকব মনে করি, ঠিক কোনও সময়ে Calling bell-এর টুংটাং ..... কেউ এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বা ঘরে আলো দেখেছেন, ঢুকে পড়লেন। তারা সব সময় যে আমাকে জ্বালাতে আসেন, তা নয়। তারা আমাকে সঙ্গ দিতেই আসেন; কিন্তু আমি তাদের বোঝাতে পারিনা যে আমার একটু নিরিবিলি সময়ের দরকার আছে। আমি সারা জীবন অসংখ্য কথা বলেছি, আমার এখন একটু চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি জানি যারা আমায় ভালবাসেন, বা আমার ভালো চান, তাঁরা আমার লেখায় কিছু মনে করছেন না, কোন দোষ ধরছেন না; কিন্তু অন্যেরা? তাঁদের কথা তাঁরাই ভাবুন। আমি অসহায় .....

শ্রীপ্রীতিকুমার সদা সদয় থাকুন, এই প্রার্থনা।

\- - - - - - - - - - - - - -

(** রচনাকাল - নভেম্বর, ১৯৮৯)

ভারতের বেদপূর্ব ও বৈদিক সমাজ **শ্রী সত্যেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত**

সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা একসঙ্গে জন্মে বা চলে। [সম + জ = সমাজ]। আদিম মানব আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য যূথবদ্ধতা এবং বৃহত্তর ভাবে সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অন্য প্রাণীদের মত মানুষের শ্ব-দন্ত বা তীক্ষ্ণ নখ নাই - যার সাহায্যে অন্য প্রাণীদের কাছ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শশক প্রভৃতির মতো দ্রুত-গতি সম্পন্নও নয় যে প্রয়োজনে পলায়ন করিয়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে। খাদ্যের জন্য অপর প্রাণীদের বধ করিবার জন্যও যূথবদ্ধ হইবার প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধ হইতেই সমাজের সৃষ্টি। আর্য্যদের সময়ে আদিম মানুষ গুহাবাসী নয় - এবং একেবারে অসহায় অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে। তারা তখন আগুনের ব্যবহার শিখিয়াছে, অস্ত্রের জন্য পাথর ও হাড় ছাড়া লৌহ পিত্তলাদির ব্যবহার শিখিয়াছে। কৃষিকার্য্যে তাহাদের হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে।

আর্য্য-পূর্ব্ব ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে এক সুসভ্য মানবজাতি বাস করিত যাহাদের আমরা মোটামুটি দ্রাবিড় জাতির শাখা বিশেষ বলিতে পারি। এই জাতির সভ্যতাই নগরভিত্তিক সিন্ধু সভ্যতা। প্রত্নতাত্বিক খননের ফলে বর্তমান সিমলাশৈলের নিকটে রোপার হইতে বর্তমান করাচীর আনুমানিক ৩০০ মাইল পশ্চিমে সুত-কাজেম-ডোর এর মধ্যে অধুনা লুপ্ত হাক্রা প্রভৃতি সিন্ধুর উপনদীর তীরবর্তী মহেন-জো-দরো ও হরপ্পা সমেত প্রায় ৮০ টি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নগরগুলির বাহিরে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতানার আর্দ্র জলাভূমিতে মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও হস্তী প্রভৃতি জন্তু বিচরণ করিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হরপ্পা প্রভৃতিতে প্রাপ্ত সিলে খোদিত চিত্র হইতে। এই নগরগুলিতে ব্যবহৃত বাসন, অলঙ্কারাদি ও যন্ত্রপাতি উচ্চমানের শিল্পনৈপুণ্য বহন করে। মালবাহী, জানোয়ার, শকট নৌকাদির সাহায্যে এই সকল দ্রব্য বহন করা হইত এবং ইহাদের সাহায্যেই পশ্চিম এশিয়া ও দাক্ষিণাত্যের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলিত। নদীবিধৌত সমতল ভূমিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইত তাহাই হরপ্পা প্রভৃতি নগরে সরবরাহ হইত।

এই সব নগরে বিরাট বিরাট শস্যাগার ছিল। ভবিষ্যতের প্রয়োজন এবং দুর্ভিক্ষাদি নিরোধের জন্যই ইহাদের ব্যবহার অনুমান করা যায়। কার্পাস ও ক্ষৌম বস্ত্রের প্রচলন ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতিতে কোন মন্দিরের অস্তিত্ব

প্রমাণিত হয়নি। বিভিন্ন সীলে ও নগর প্রাকারের দেওয়াল লিপিতে বিস্তর মাতৃমূর্ত্তি, শিব ও শিবলিঙ্গ দৃষ্টে মনে হয় সাধারণভাবে মহাদেবী ও শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বৃক্ষ, প্রস্তরাদির পূজাও চলিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নর্তক ও নর্তকীর মূর্তি সুপ্রসিদ্ধ। যোনি ও লিঙ্গের প্রতিরূপ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে, এদের সঙ্গে তন্ত্র-উপাসনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সুবিদিত। তাছাড়া যোগাসনে যোগী-মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত হইতে অনুমিত হয়, তন্ত্রাচার ও যোগ এই সভ্যতার অধ্যাত্মবোধের দিগন্ত নির্দেশিত করে। তন্ত্রের আগম যামল গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হয় সংস্কৃত লিপিতে। তান্ত্রিকদের মতে তন্ত্র লিপিবদ্ধ না থাকিলেও বৈদিক মত হইতে প্রাচীনতর।*

*[এখন মোটামুটি জানা গিয়েছে যে চীন ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এক কালে তন্ত্রপ্রধান উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। একটা শ্লোকে দেখা যায় বশিষ্ঠদেব (বশিষ্ঠ একাধিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়) চীনদেশ হইতে তন্ত্র ভারতে প্রচলন করেন।]

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত দ্রব্যাদি হইতে দেখা যায় তীর, ধনুক, প্রস্তর, পিতল, তাম্রনির্মিত অস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল - কিন্তু লৌহের ব্যবহার বোধহয় অজানা ছিল। পশুপক্ষীর চিত্রাদির মধ্যে ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখা যায় না। যদিও গাভী, বলদ, উট ও হস্তীর প্রতিকৃতির অভাব নাই। আর্য্য সঙ্ঘর্ষের পূর্ব পর্যন্ত এই উচ্চমানের সভ্যতার ধারা ২/৩ হাজার বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সিন্ধু সভ্যতার লিপি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই - সম্ভব হইলে আরও বহু তথ্য পাওয়া যাইত।

আর্য্য জাতির মূল ধারা হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমের গোলান, বেবিলন, খাইবার ইত্যাদি প্রচলিত পথে আসে, সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে। আর্য্যদের মূল আবাস পারস্যের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমে তৃণভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে। এদেরই এক মূলশাখা পারস্যে বসতি স্থাপন করে আরও পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই অগ্রসরমান দল ভারত ও পারস্য সীমান্তে কাসাইট ও মিটানিয়া নামক দুইটি রাজ্য স্থাপন করে। এদের সঙ্গে সিন্ধু অববাহিকায় অবস্থিত রাজ্যগুলির সঙ্ঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকতর সভ্য হইলেও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা অধিকতর সুসংবদ্ধ ছিলনা। তাছাড়া তাহাদের অশ্ব ও লৌহনির্মিত অস্ত্র ছিল না। এজন্য

মনে হয় তাহারা আর্য্যদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাঁদের সংগঠন শক্তি অনেক বেশী ছিল। তবে সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির ও পশ্চাদপসারণের কারণ কেবল আর্য্য আক্রমণ নয়। অযৌক্তিক ভাবে বনভূমি ধ্বংস, আবহাওয়ার পরিবর্তন, সিন্ধু ও তাহার উপনদীর গতি পরিবর্তন, বন্যা প্রভৃতি ইহার মূল কারণ। যুদ্ধে ঘোড়া ও লৌহনির্মিত অস্ত্রাদির সুষ্ঠু ব্যবহার আর্য্যদের জয়ের কারণ বলে মনে হয়। আর্য্যরা জয়ের পর নির্ব্বিচারে এদের জনপদ প্রভৃতি এবং নগর ধ্বংস করিতেন। আর্য্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে আর্য্যদের প্রধান যোদ্ধা ইন্দ্রকে এজন্য পুরন্দর বা পুরধ্বংসকারী বলা হইত।

ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্র ছিল। তবে তা সর্বত্র বংশগত ছিল না। বৌদ্ধপূর্ব যুগে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বে লিচ্ছবীদের দেশ গণতন্ত্র দ্বারা শাসিত হইত। প্রজাদের "বিশ" বলা হইত। এই বিশপতিদের প্রধানরা ধীরে ধীরে বংশগত রাজা হইয়া উঠেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে রাজা নির্বাচনের উল্লেখ আছে। মনে হয় দেশে আর্য্য ও দাস এই দুইটি প্রাচীন শ্রেণী ছিল। ঋগ্বেদের শেষের যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণভেদ স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এই জাতিভেদ বংশগত ছিলনা। অনার্য্যরাই ছিল দাস জাতি বা দস্যু - যা থেকে পরে শূদ্র জাতির উদ্ভব। নানা বৃত্তি অনুসারে মানুষের জীবিকা উপার্জিত হইত। পশু, গরু, ছাগ প্রভৃতির সহিত কুকুরও পালিত হইত। দেশে ধনী ও দরিদ্র ছিল - তবে দানকর্মকে উৎসাহ দেওয়া হইত। ঋগ্বেদে ব্রীহি বা যব ভিন্ন অন্য শস্যের বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু অথর্ব্ব বেদে গম ও ধান্যের উল্লেখ আছে। তণ্ডুল নামটি আসে কুটিবার সময়ে ধান যে লাফায় এর থেকে। (তাণ্ডব, তণ্ডুল শব্দ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন)। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৬৩ সূক্তে রাজা যে কর গ্রহণ গ্রহণ করিতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে নানা শ্রেণীর গৃহ ও অট্টালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা বরুণ সহস্রদ্বার বিশিষ্ট হর্ম্মে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। রাজা যখন ছিলেন, তখন শাসনকেন্দ্রস্থল হিসাবে নগরও ছিল। কিন্তু দেশের বেশীরভাগ লোকই ছিল কৃষক। কৃষিকার্যের জন্য লাঙ্গল ও বলিবর্দ্দ ব্যবহার করা হইত। 'সীর', 'সীতা' প্রভৃতি শব্দ লাঙ্গলের ব্যবহার স্পষ্ট করে। ভূমিকর্ষণে জলসেচের জন্য প্রধানতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভর করা হইত। ঋগ্বেদে বহুস্থানে মেঘ ও বজ্রের উল্লেখ আছে। পুঞ্জীভূত মেঘকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া বর্ষণ করান। এই লইয়া ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুর, অহি প্রভৃতির যুদ্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

কৃষিকার্য ছাড়া পশুপালন আর্যদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল। দুগ্ধের জন্য গোপালন করা হইত। তখন 'ধন' বলিতে গোধনই বুঝাইত। অবশ্য মহিষও ব্যবহৃত হইত। 'অসুর' কর্তৃক 'গোধন' হরণ ও আর্য্যবীরদের দ্বারা তাহার পুনরুদ্ধারের বহু কাহিনী বেদ-এ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দস্যুদের দ্বারা দেবতাদের গোযূথ হরণ ও পর্ব্বতের উপত্যকায় ইহাদের লুকাইয়া রাখিবার কথা এবং সরমা কুক্কুরীর সাহায্যে তাহাদের সন্ধানলাভ, ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের উদ্ধারের কাহিনী উল্লেখ করা যায়। আর্য্যদের একটি প্রিয় খাদ্য ছিল 'পুরোভাগ' (পিষ্টক)। ইহা প্রধানতঃ যব ও ছাগ মাংসের সাহায্যে প্রস্তুত হইত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, অশ্ব ব্যতীত ছাগ, মহিষ ও গর্দ্দভ ও ছিল। গোমাংস সুখাদ্যরূপে অতিথি সৎকারে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অতিথির নামই ছিল 'গোঘ্ন'। ঋগ্বেদের এক সূক্তে বলা হইয়াছে বৃষ পাক করিয়া দিলে ইন্দ্র তৃপ্ত হইতেন।

আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ কোথায় ছিল তাহা সোজাসুজি ঋগ্বেদে উল্লিখিত নাই। তবে ঋগ্বেদে নদীর উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তে (১০/ ৭৫) ১৯টি নদীর উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনারও উল্লেখ আছে। সপ্ত সিন্ধু (সিন্ধু ও তাহার উপনদী সকল) ও গঙ্গা যমুনার উপত্যকায় আর্য্য বসতি গড়িয়া উঠে। সে সময়ে সরস্বতী একটি বৃহৎ নদী ছিল। আজ তাহা অবলুপ্ত। (রাজপুতনার মরু অঞ্চলে ঘর্ঘর নদীই কি সরস্বতী?) আর্য্যবসতি পশ্চিমে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও সিন্ধু ছাড়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীই ছিল। ধনীদের দান করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত। পক্ষান্তরে জীবন ধারণের জন্য বা কোন কারণে অপরের উপর নির্ভর করিতে সে যুগের মানুষ সঙ্কোচ বোধ করিত। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ২৮ সূক্ত ১১ ঋকে প্রার্থনা করা হইয়াছে, "হে বরুণ, আমাকে যেন কোন ধনী ও প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট দারিদ্র্যের (আমার ও জাতির) কথা বলিতে না হয়। আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়।"

পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক - নিজের পুত্র না থাকিলে দৌহিত্রকে দত্তক লইবার রীতি ছিল। বর্ণাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ঋগ্বেদে সন্ন্যাস ও যতিদের আশ্রম প্রথা প্রায় অস্বীকৃতই ছিল। কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন ব্যতীত জীবনধারণের জন্য নানা বৃত্তির উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। যেমন বস্ত্র বয়নকারী

(তাঁতী) তন্তুবায়, ত্বষ্টা বা সূত্রধর বা ছুতার, মৃৎশিল্পী, মাল্যকার, ক্ষৌরকার ইত্যাদি। সেকালে একান্নবর্তী পরিবার ছিল এবং বিবাহ প্রথা মোটামুটি বর্ত্তমানের মতই ছিল। সূর্যকন্যা সূর্য্যার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবাহে বিরাট শোভাযাত্রার বর্ণনা আছে। পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের রীতি ব্যতীত একই নারীর একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা কেবল মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দেখা যায় এ কথা ঠিক নয়। সূর্য্যার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বিবাহের কথা আছে। মূর্তিপূজা বা মন্দির ছিল না। ধর্ম্মের প্রধান ক্রিয়া ছিল যজ্ঞ ও স্তোত্রপাঠ। নারী ও পুরুষ একত্রে যজ্ঞ করিতেন ও স্তোত্রপাঠে অংশ নিতেন। উভয়েরই হোতা হইবার অধিকার ছিল। ('পত্নী'র উৎপত্তিগত অর্থ হইল যিনি পতির সহিত মিলিত ভাবে যজ্ঞ করেন)। নারীরা অধ্যাপনাও করিতেন। আচার্য্য শব্দের দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ – আচার্য্যা ও আচার্য্যানী। আচার্য্যা নিজে বেদের ব্যাখ্যা করিতেন এবং আচার্য্যের স্ত্রীকে আচার্য্যানী বলা হইত। বেদের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বিদূষী এবং উপনয়ন হওয়া প্রয়োজন। মনে হয় সেকালে নারীদের উপনয়ন ও সমাবর্তন (গুরুগৃহে পাঠ সম্পন্ন হইবার পর প্রত্যাবর্তন) ছিল। বম্বে হইতে প্রকাশিত মনুস্মৃতির একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

"পুরাকলেণ কুমারীনাং মৌজীবন্ধন সষ্যতে ।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ।।"

শব্দকল্পদ্রুমানুসারে 'মৌজীবন্ধন' অর্থ উপনয়ন।

আমাদের চোখে ঋষির স্থান অত্যন্ত উচ্চে। ঋগ্বেদে অন্ততঃ সাতজন মহিলা ঋষির নাম পাই। (ক) প্রথম মণ্ডলে ১৭৯ সূক্তে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা; (খ) ৫ম মণ্ডলে ২৮ সূক্তে বিশ্ববারা; (গ) ৮ম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে অপালা; (ঘ) ১০ম মণ্ডলে ৩৯ ও ৪০ সূক্তে ঘোষা; (ঙ) ১০ম মণ্ডলে বিখ্যাত বিবাহ সূক্তে সূর্য্যা; (চ) ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে (ইহা আত্মা সূক্ত নামে বিখ্যাত) অম্ভৃণকন্যা বাক; (ছ) ১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তে ইন্দ্রানী। অন্যান্য বেদে উল্লিখিত গার্গী ও মৈত্রেয়ী ছাড়া সরমা, শ্রদ্ধা ও মেধা ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। বাক ঋষির আত্মাসূক্ত সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেশ্যারা সমাজে ঘৃণ্য ছিল না। তাহাদের বলা হইত সাধারণী। তথাকথিত জারজ সন্তানেরা মানবোচিত গুণের অধিকারী হইলে সমাজে তাহারা স্বীকৃত হইত।

ঋষি গৌতম কর্তৃক ভর্তৃহীনা জাবালার পুত্র সত্যকামকে তাহার সত্যবাদিতার জন্য শিষ্যরূপে গ্রহণ ইহার সমধিক প্রমাণ। বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ দিয়াছেন ও তাহার বৈধতা স্বীকার করেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

অবসর বিনোদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল দ্যূত বা অক্ষক্রীড়া। শৌণ্ডিকালয়ের মত অক্ষক্রীড়ার জন্য পৃথক আলয় ছিল। কিন্তু বেদ-এ মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া নিন্দিত ছিল।

প্রাচীনতম কালে আর্য্যরা পৃথিবী বা অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে প্রাকৃতিক বিষয়ে যেখানেই দেবত্ব (শাস্ত্রমতে যিনি দান করেন তিনিই দেবতা) আরোপ করিয়াছেন। প্রধানতঃ ঋগ্বেদের সূত্রগুলি আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাব নিয়াই রচিত। ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে দেবতাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ৮/২৮/১ এ ৩৩টি।

মূল দেবতাদের অবস্থান হিসাবে ভাগ করা যাইতে পারে-

পৃথিবীস্থান - অগ্নি, পৃথিবী, অপ, ব্যোম

অন্তরীক্ষ - ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য

দ্যুলোক - সূর্য্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বিনীদ্বয়, ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি।

বেদে মূর্তিপূজা নাই, উপাসনারীতি অতি সরল ছিল। সমিধ বা কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে ঘৃত বা সোম আহুতি দিয়া ও রচিত স্তুতি আবৃত্তি করিয়া দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করা হইত। বহুদেবতার মধ্যে ঋষিরা অতিদেবতার সন্ধান করেন। এই অতিদেবতা তিনজন - অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। কিন্তু অতিদেবতাকে স্থাপন করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তাঁহার চিন্তাশীল দার্শনিক মন ঈশ্বরকে একক শক্তি হিসাবে দেখিতে উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন- শক্তি একই, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন উপলব্ধির ফলে তাঁহার উপর পৃথক পৃথক নাম আরোপ করা হয়। ১/১৬৪/৪৬ ঋকে বলা হইয়াছে -

"একং সদ্‌বিপ্র বহুধা বদন্তি যদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহ ।"

ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলে বর্ণনা করে। ইঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে। সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে আর্য্যমত পাই নাসদীয় সূক্তে। সেখানে ঋগ্বেদ (১০/১২৯) বলা হইয়াছে - সৃষ্টির পূর্বে যাহা আছে তাহাও ছিল না,

যাহা নাই তাহাও ছিল না। তারপর তপস্যার প্রভাবে একটা বুদ্ধিযুক্ত সত্তার উদ্ভব হইল। তাহার মধ্যে কামনার উদ্ভব হইল। এই কামনা হইতেই সৃষ্টির সূত্রপাত। তাহার পর প্রজাপতি সূক্তে (১০/১২১) পাই একেশ্বরবাদের বীজ। আত্মাসূক্ত বা দেবীসূক্তে আত্মাকেই বলা হইয়াছে এক দেবতা, যিনি সর্ব প্রাণী ও দ্যুলোকে ভূলোকে আবিষ্ট, সমস্ত ভুবনে বিস্তারিত। [উল্লেখ করা যায় ইহা অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক ঋষির কাছে উদ্ভাসিত]। ১০/৮১/৩ -এ বলা হইয়াছে- "সে এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চোখ, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ। ইনি দুই হস্ত ও বিবিধ পক্ষ সঞ্চালন পূর্বক নির্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচিত হয়।"

আজ নানা সমস্যাজড়িত, নানা মত ও পথে বিভক্ত ভারতবাসীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের পরিসমাপ্তিসূচক শ্লোকটি দিয়া (১০/১৯১/২-৪) আমরাও এই প্রবন্ধের ছেদ টানিতেছি -

"সংচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজ্ঞানানা উপাসতে ।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।
সমানী ব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।"

"একসঙ্গে চল, তোমাদের অভিপ্রায় যেন এক হয়, অন্তঃকরণ যেন এক হয়, মন এক হয়। প্রাচীন দেবতাদের মত একমত হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করো, একই রকম মন্ত্রোচ্চারণ করো, মন চিত্ত সকলই একপ্রকার হউক, একই মন্ত্রে মন্ত্রিত হও। আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই।।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ

গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন বাগবাজারে দীনু বসুর বাড়ীতে। তবে সান্নিধ্যে আসেন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে। ঠাকুর যত্ন করে কাছে বসিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?" গঙ্গাধর বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ছেলেবেলায় দীনু বসুর বাড়ীতে দেখেছিলাম।" খুব ছেলেবেলা' কথাটা শুনে ঠাকুরের কি হাসি! গোপালদাকে ডেকে বললেন, "ওহে, শোন শোন এ বলছে কিনা আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উঃ! এর আবার ছেলেবেলায়।" ঠাকুর সেদিন এই নবাগত ভক্তকে বাড়ি যেতে দিলেন না, রাত্রিতে কাছে রাখলেন এবং পরের দিন সকালে শনিবার দিন আবার আসতে বলে সস্নেহে বিদায় দিলেন। শনি মঙ্গবার কেবল ঠাকুর প্রিয় ভক্তদের আসতে বলতেন। বলতেন শনিবার মধুবার।

পরের শনিবার গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বর গেলে ঠাকুর কিভাবে সুখাসনে বসে ধ্যান করতে হয় দেখিয়ে দেন। তারপর তাঁর জিবে কি যেন একটা লিখে দীক্ষা দেন। ঠাকুর সাধারণত এভাবে দীক্ষা দিতেন না। দু একজন ভাগ্যবানই কেবল এইভাবে দীক্ষা পেয়েছিলেন। ঠাকুর মাদুরে শুয়ে গঙ্গাধরের কোলে পা তুলে দিয়ে পদসেবা করতে বললে গঙ্গাধর এমন জোরে চাপ দিয়েছিলেন যে ঠাকুর যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন। গঙ্গাধরের তখন খেয়াল হয় যে ঠাকুরের শরীর অতিশয় কোমল, যেন হাড়ের ওপর মাখন মাখানো। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, সব ভক্তই ঠাকুরের পদসেবার সুযোগ পেতেন না। ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ দিব্য তনু সকলের স্পর্শ সহ্য করতে পারত না।

গঙ্গাধর মালসা পুড়িয়ে হবিষ্যি করতেন এবং নানা বিষয়ে কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়ে ভর্ৎসনা করে সহজভাবে জীবনধারণে অভ্যস্ত করেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তুই ছেলেমানুষ, তোর অত বুড়োটেপনা ভাব কেন?" প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হতে পারে মনে করে ঠাকুর তাঁকে নিত্য গায়ত্রী জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ ও শিক্ষায় গঙ্গাধরের জীবন যাপন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কালী ঘরের প্রসাদ বা খাবার পর এক খিলি পান – ঠাকুরের দেওয়া কোন

DO NOT COPY

কিছুতেই তিনি আপত্তি করতেন না। তবে ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সংযম বা কঠোরতা নিন্দনীয় নয়, আচারের মাত্রাধিক্যই অন্যায়।

ঠাকুর নানাভাবে গঙ্গাধরকে শিক্ষা দিতেন। একদিন একটা লোক পয়সা চাইলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে তাকের উপরে রাখা চারটি পয়সা তাকে দিতে বলেন। তারপর লোকটি চলে গেলে তিনি গঙ্গাধরকে গঙ্গাজলে হাত ধুতে বলেন এবং তাঁকে মা-কালীর পটের সামনে নিয়ে গিয়ে 'হরিবোল, হরিবোল' উচ্চারণ করালেন এবং অনেকবার হাত বাড়ালেন। এর ফলে গঙ্গাধরের মনে চিরকালের জন্যে ধারণা হয়ে গেল যে কাঞ্চনাসক্তি পরিত্যজ্য।

মৃন্ময়েও যে চিন্ময়ের দর্শন পাওয়া যায় ঠাকুরের কৃপায় গঙ্গাধর তাও উপলব্ধি করেছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে ভবতারিনী মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেন, "এই দ্যাখ চৈতন্যময় শিব।" সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন সত্যই শিব চৈতন্যময় এবং রক্তমাংসের মানুষের মতো নিঃশ্বাস ফেলছেন।

একদিন ঠাকুর গঙ্গাধরকে ডেকে বললেন, "প্রার্থনা কি করে করতে হয় জানিস?" তারপর ছোট ছেলের মতো হাত পা ছুঁড়ে অঝোরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "মা আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি কিছু চাই নে মা। আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে পারি না মা"। ঠিক একটা ছেলের মতো ঠাকুরকে এইভাবে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে দেখে গঙ্গাধরের ধারণা হয়ে গেল ঈশ্বর কেমন প্রার্থনায় সাড়া দেন।

ঠাকুর ভক্তদের প্রকৃতি অনুসারে সঠিক দোসর জুটিয়ে দিতেন তাতে তাদের ভাবের বিকাশ বা চরিত্র গঠনের সুবিধা হত। গঙ্গাধরকে উপদেশ দিয়েছিলেন নরেন্দ্রর (স্বামীজীর) সঙ্গ করতে। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "দ্যাখ, নরেন একশোটা পান খায়, যা পায় তাই খায়। এত বড় চোখ ভেতর দিকে টান। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায়, আর বাড়ি, ঘর দোর, ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস।

গঙ্গাধর শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ যা মূলত ঠাকুরেরই শিক্ষা, গঙ্গাধর মহারাজ প্রথম বাস্তবায়িত করেন। মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠে সেবাব্রতের যে অনুষ্ঠান

DO NOT COPY

করেছিলেন বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে সেই কার্যই আজ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

স্বামী সুবোধানন্দ

সুবোধচন্দ্র ঘোষ যাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী সুবোধানন্দ রামকৃষ্ণ ভক্তমন্ডলীতে 'খোকা মহারাজ' নামে খ্যাত ছিলেন। ঠাকুর এবং বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাইরা তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন।

সুবোধচন্দ্র পিতার কাছ থেকেই প্রথম ঠাকুরের কথা শোনেন এবং তারপর ঠাকুরকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বন্ধু ক্ষীরোদ মিত্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর তাঁকে পরম আদরে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর হাত ধরে বিছানার ওপর বসিয়েছিলেন। রাস্তায় কত লোককে ছুঁয়েছেন, জামা কাপড় অপবিত্র হয়ে গেছে, এই সব ভেবে সুবোধচন্দ্র ঠাকুরের বিছানায় বসতে চাননি। ঠাকুর তাঁকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুই এখানকার; কাপড়ে কি আসে যায়!" সেই মুহূর্তে সুবোধ চন্দ্রের ঠিক ঠিক ধারণা হয়ে গেল তিনি ঠাকুরের। যার জিনিষ যার লোক সেই টেনে নেয়। বিদায় নেবার সময় ঠাকুর তাঁকে শনি মঙ্গলবার দেখে আবার যেতে বলেছিলেন।

পরের শনিবারই সুবোধচন্দ্র ঠাকুরের টানে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর তাঁর জিবে মন্ত্র লিখে দিয়ে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ধ্যানে বসে সুবোধের মনে হয় মেরুদন্ড দিয়ে কি যেন একটা উপরে উঠছে। তারপর তাঁর বাহ্যিক চেতনা লোপ পেল। ক্রমে তিনি দেখলেন, ঠাকুর যেখানে দাঁড়িঁয়েছিলেন সেখানে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি রয়েছে, তার মধ্যে কখন কখন ঠাকুরের মূর্ত্তিও দেখা যাচ্ছে। অবশেষে সব অসীমে বিলীন হয়ে গেল এবং তিনি অপূর্ব আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন। বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে সুবোধচন্দ্রকে ধ্যান থেকে জাগিয়ে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন আগে ঠাকুর দেবতার কথা চিন্তা করতেন বলেই তাঁর অত তাড়াতাড়ি সব হোল অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগ্রত হল।

'খোকা'র সঙ্গে ঠাকুরের স্নেহের লীলাটি ছিল বড়ই মধুর। কোনদিন ঠাকুর সুবোধের হাতে পাখা দিয়ে বলতেন, হাওয়া কর। আবার কখন ঠাকুর

সুবোধকে পাশে শুইয়ে তাঁকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতেন। ধ্যান, জপ ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুবোধকে ঠাকুর প্রয়োজন মতো উপদেশ দিতেন। তবে সুবোধচন্দ্রের ভাবটি ছিল শরণাগতের। ঠাকুরকে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, "ধ্যানট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলত– আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল? এই নির্ভরতাকে ঠাকুর তুচ্ছ করেন নি। প্রিয় সন্তানের আবদার মেনে নিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "আচ্ছা, ওসব তোকে কিছুই করতে হবে না। তুই দুবেলা একটু স্মরণ মনন করে নিস।"

সুবোধের বালক স্বভাব, মনে কোন প্রশ্ন উঠলে বা সংশয় দেখা দিলে তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করতেন না। ঠাকুরও 'খোকা'র কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনও বিরক্ত হতেন না। একদিন ঠাকুরের ঘরে সংকীর্তনের সময় অনেক ভক্ত ভাববিহ্বলতা প্রকাশ করেছিলেন। সুবোধচন্দ্রের সন্দেহ হয়েছিল সবাই অতটা ভক্তি বিহ্বল হন নি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল? ঠাকুর বলেছিলেন, আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে, আর সব অল্প স্বল্প।"

সুবোধ চা খেতে ভালবাসতেন। শিশুদের লজেন্সের প্রতি যেমন টান, সুবোধের তেমনি টান ছিল চায়ের প্রতি। একবার স্বামীজী তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "এমন বর দিন যাতে কোনদিন আমার সকালের চা বাদ না পড়ে।" চা ছিল তাঁর কাছে সর্বরোগহর। ঠাকুরকেও চা খেতে উৎসাহিত করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। ঠাকুরের গলা ব্যথা হলে তিনি সরলভাবে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আপনি চা খান। আমাদের গলা ব্যথা হলে আমরা চা খাই, আমাদের গলা ব্যথা সেরে যায়।" সরল ঠাকুর সেই কথায় বিশ্বাস করলেন এবং বললেন, "তবে চা খাই।" চা গরম জিনিষ, খেলে ঠাকুরের সহ্য হবে না ভেবে রাখাল মহারাজ আপত্তি করলে ঠাকুর শেষ পর্যন্ত চা না খাওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। তারপর বেশ পরিহাস করে সুবোধচন্দ্রকে প্রবোধ দিলেন, "ওরে, সইল না।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও 'খোকা'র সঙ্গে তাঁর সেই সহজ সরল ভাবটি বজায় ছিল। একবার তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের সময় ভাদ্রমাসে সুবোধচন্দ্রকে ফল্গু নদী পার হয়ে যেতে হয়। নদীতে তখন এক কোমর জল। একজন পার হচ্ছে দেখে তিনিও পার হবার চেষ্টা করেন। নদী পার হবার সময় হঠাৎ নদীতে জল

বেড়ে যায়। খোকা মহারাজ সাঁতার জানতেন না। তাই মৃত্যু অবধারিত জেনে তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করে বললেন, "এই লও ঠাকুর, শেষ প্রণাম।" প্রণাম শেষ হতে না হতেই খোকা মহারাজ জলে ডুবে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু পরেই দেখলেন কে যেন তাঁকে নিরাপদে তীরে তুলে এনেছে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) একদিন দক্ষিণেশ্বর এলে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে পালোয়ানের ভঙ্গিতে কুস্তি লড়তে এগিয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত পালোয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ঠাকুর হার মেনেছিলেন এবং হাসিমুখেই। তবে প্রবল প্রতিপক্ষও যে খুব একটা জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন তা নয়। ঠাকুরের হাতে হাত দিয়ে তিনি যখন নকল কুস্তিতে রত তখন তাঁর মনে হল যেন একটা অলৌকিক শক্তি ঠাকুরের দেহ থেকে সিড় সিড় করে তাঁর নিজের দেহে প্রবেশ করছে। তার ফলে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত এবং অবশপ্রায় হয়ে পড়ল। তিনি শরীরে মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। এই ঘটনায় ঠাকুরের অকপট ভালবাসা ও তাঁর দিব্য সত্তার কথঞ্চিৎ পরিচয় পেয়ে হরিপ্রসন্ন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিদায়ের আগে হরিপ্রসন্নের পিঠ চাপড়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "মাঝে মাঝে এখানে আসিস। একদিন এলে কি হয়?"

ঠাকুরের সাদর আহ্বান হরিপ্রসন্ন অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। এরপর মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হতেন এবং বাড়ির আপত্তি সত্ত্বেও রাত কাটিয়ে যেতেন। হরিপ্রসন্নের আসতে দেরী হলে ঠাকুর তাঁর খোঁজ নিতেন, ডেকে পাঠাতেন। একবার অনেকদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর হরিপ্রসন্নকে পরম আত্মীয়ের মতো বলেছিলেন, "কি রে! কেমন আছিস? আজকাল আসা যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস, ডেকে পাঠালেও আসিস না।"

ঠাকুরের কাছে ঈশ্বর বৈ অপর কোন প্রসঙ্গ ছিল না। ভক্তদের মধ্যে কে কতটা ঈশ্বর চিন্তা করছে–এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা বা জিজ্ঞাসা। হরিপ্রসন্নকেও তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ধ্যান ট্যান করিস তো?" উত্তরে হরিপ্রসন্ন বলেছিলেন যে তিনি ধ্যানের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁর ধ্যান হয়না। এ কথা শুনে ঠাকুর তাঁর জিবে কি একটা মন্ত্র লিখে দিয়ে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরের অলৌকিক স্পর্শে হরিপ্রসন্ন অচিরেই ভাবে

বিভোর হয়ে পড়েন। পঞ্চবটী পর্যন্ত পায়ে চলাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ধ্যানে বসার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এই তাঁর প্রথম গভীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানের অভিজ্ঞতা। ধ্যান ভাঙ্গলে তিনি দেখলেন ঠাকুর তাঁর গায়ে হাত বুলাচ্ছেন এবং মুচকি মুচকি হাসছেন। তারপর ঠাকুর তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে সাধন সম্পর্কে বহু উপদেশ দেন এবং আশ্বাস দেন যে এরপর তাঁর ধ্যান হবে। ঠাকুরের এই আশ্বাস ব্যর্থ হয়নি। জীবনের একটি দীর্ঘসময় তিনি সারারাত ধ্যানেই অতিবাহিত করতেন।

ঠাকুর হরিপ্রসন্নকে দেখেই বুঝেছিলেন তিনি তাঁর চিহ্নিত অন্তরঙ্গ ভক্ত। ভবিষ্যতে একটি মহৎ ভূমিকা পালনের জন্যে তিনি তাঁকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একদিন তাঁকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, "দ্যাখ তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগেনা। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি। সোনার মেয়ে মানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।" অখন্ড ব্রহ্মচর্যের এই উপদেশ হরিপ্রসন্নকে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন হরিপ্রসন্ন ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেন "যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এ শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ।" হরিপ্রসন্নের কিন্তু সেদিন একথা বিশ্বাস হয়নি। অন্তর্যামী ঠাকুর মনে হয় সে কথা বুঝেছিলেন। পরে আর একদিন রাসলীলা এবং গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল, সেই এই শরীরটাতে আছে।" সেদিন ঠাকুরের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিলো যা দেখে শুনে হরিপ্রসন্ন আর ঠাকুরের কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাস হল ঠাকুর নরদেহে স্বয়ং ভগবান।

হরিপ্রসন্নের মনে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে নানা সংশয় ছিল। একদিন ঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" ঠাকুর বলেছিলেন "সাকারও নিরাকারও। যা কিছু দেখছিস, সবই ঈশ্বর।" এই একটি কথাতেই যে সেদিন হরিপ্রসন্নের মনে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল তা নয়, তবে ঠাকুরের কথায় এমন কোন শক্তি ছিল যা শ্রোতাকে এই বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি লাভে সহায়তা করেছিল। পরবর্তী কালে তিনি এই ঘটনাটি বারংবার আবেগভরে বর্ণনা করতেন। তাতে মনে হয় তিনি তখন ঐ উপলব্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ সবই ঠাকুরের কৃপা।

ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় হরিপ্রসন্ন কলকাতায় ছিলেন না, পড়াশুনার উদ্দেশ্যে বাঁকিপুর রওনা হয়েছিলেন। সন্তানের প্রতি ঠাকুরের কি ভালবাসা। দেহত্যাগের পরমুহূর্তে তিনি হরিপ্রসন্নকে সশরীরে দর্শন দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য বোঝেননি। পরের দিন সংবাদ পত্রে ঠাকুরের লীলাবসানের সংবাদ পড়ে সব বুঝতে পারলেন।

ঠাকুরের টানে ঠাকুরের নামে এই মহাপুরুষ সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন। ঠাকুরের কাজ অসম্পূর্ণ থাকতে তিনি স্বর্গলাভেও সম্মত ছিলেন না। স্বয়ং শিবঠাকুরও তাঁর এই গুরুভক্তির জন্যে সশরীরে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ সাধারণত এলাহাবাদে থাকতেন। কাশীর সেবাশ্রমের বাড়ি তৈরীর জন্যে তিনি কাশী স্টেশনে নেমে সেবাশ্রমে যাবার পথে গাড়ি উল্টে যায় এবং তিনি আহত হন এবং আঘাতের ফলে জ্বরও হয়। কাজের ক্ষতি হবে ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন এবং বাবা বিশ্বনাথকে স্মরণ করে মনে মনে বলতে লাগলেন, "হা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্যে তোমার রাজত্বে এলাম– নিঃস্বার্থ কাজ। তা এরকম হল? কাজের ক্ষতি হচ্ছে!" মাঝরাতে স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং শিব সহাস্য মুখে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। ভাবলেন তাঁকে নিতেই শিবঠাকুর এসেছেন। তিনি বললেন, "আমি যাব না, ঠাকুরের কাজ আছে, তাই আগে করতে হবে।" শিবঠাকুর মুখে কোন কথা না বলে আগের মতোই হাসতে হাসতে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাঁর হিমশীতল স্পর্শে মহারাজের সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। তখন তিনি শিব ঠাকুরকে বললেন, "এখন তবে এস; ঠাকুরের কাজ করতে হবে।" শিবঠকুর চলে গেলেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে মহারাজ দেখলেন তাঁর গায়ে জ্বর নেই, পায়ে ব্যথাও নেই, সব সেরে গেছে।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

ঠাকুর ভক্তদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতার পুরুষ বা প্রহ্লাদ প্রমুখ ভক্তগণ। পূর্ণচন্দ্র তাঁর ঈশ্বরকোটি ভক্তদের অন্যতম ছিলেন।

ঠাকুর সব ভক্তকেই ভালবাসতেন। তাঁরা সবাই অনুভব করতেন অমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা অপর কারো কাছ থেকেই পাননি, এমন কি মা বাবার কাছ থেকেও না। তথাপি একথা হয়ত বলা যায় না যে ঠাকুর সবাইকে সমান মাত্রায় ভালবাসতেন। হয়ত তারও কারণ আছে। আসলে ঠাকুর ঈশ্বর বৈ আর কিছুই ভালবাসতেন না। যাঁর মধ্যে তিনি ঈশ্বরীয় সত্তার বেশী প্রকাশ দেখতেন তাঁকেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। দু একজনের প্রতি ভালবাসা যেন উথলে পড়ত। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভালবাসার কোন তুলনা নেই। তবে নরেন্দ্রনাথের পরেই যদি আর কারো নাম করা চলে, তিনি পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণ ছিলেন কথামৃতকার শ্রীম-র ছাত্র। তাঁর সঙ্গেই তিনি প্রথম ঠাকুরের কাছে আসেন। ঠাকুর তাঁকে কাছে বসিয়ে পরম আদরে ফল মিষ্টি খাইয়েছিলেন এবং বিদায়ের সময়ে তাঁর চিবুক ধরে স্নেহ ভরে বলেছিলেন, "তোর যখন সুবিধা হবে এখানে চলে আসবি- গাড়িভাড়া এখান থেকে নিবি।" ঠাকুরকে দেখা অবধি পূর্ণের ভিতরে এক অলৌকিক আনন্দের স্রোত বইছিল, চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছিল। কোনমতে আত্মসম্বরণ করেই যেন তিনি সেদিন বাড়ি ফেরেন।

ঠাকুরের টানে এরপর পূর্ণ মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া করতে থাকেন। তখন ঠাকুরই যেন তাঁর সব, ঠাকুর ছাড়া অন্য কারো সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে না। ঠাকুরও দু-একদিন পূর্ণকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়তেন, সুবিধা পেলেই কারো হাতে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, এমন কি পূর্ণের দেখা না পেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জলও পড়ত। তাঁর এই ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করলে ঠাকুর বলতেন, "পূর্ণের উপর এই টান দেখেই তোরা অবাক হয়েছিস, নরেন্দ্রর জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যে-রকম ব্যাকুল হত ও যে-রকম ছটফট করতাম তা দেখলে না জানি কি হতিস।" ঠাকুর আরো বলতেন, "পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে! কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, "আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য।"

ঠাকুর পূর্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখতেন। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে একদিন বলেছিলেন, "পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর বিষ্ণুর অংশে জন্ম।" তিনি আরো বলেছিলেন, "যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপধুনার গন্ধ দেওয়া যায়, তাহলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বিধি হয়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন-নারায়ণ

দেহ ধারণ করে এসেছেন।" মালা চন্দনে ভূষিত করে ঠাকুর একদিন পূর্ণকে খাইয়েছিলেন, তবে নিজের হাতে নয়, শ্রী শ্রী মাকে দিয়ে। পূর্ণ সে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন-"আমাকে নহবতখানার ভিতর নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বললেন, এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম। স্ত্রীলোকটি আমার ঠিক মায়ের মতো স্নেহ ভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওগো, এই তরকারিটা বেশী করে দিও।' আবার যান আবার আসেন। দাঁড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন। আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে হাত-মুখ ধোয়ার জল ঢেলে দিতে বললেন। পরে তাঁকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো ষোল আনা দিও।' স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি তখন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধহয় ঠাকুরে কোন মেয়ে ভক্ত। পরে যখন মাঠাকরুনকে প্রণাম করতে যাই তখন দেখি সেই তিনি, আমাদের মা।"

পূর্ণ বাবার ভয়ে ইচ্ছেমত দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতেন না। পূর্ণের অদর্শনে ঠাকুরেরও মন কষ্টের অবধি ছিল না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে কলকাতায় এসে পূর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মাষ্টারমশাই একদিন পূর্ণের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সংগোপনে ডেকে বলেন, "ঠাকুর শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন-সঙ্গে এসো।" পূর্ণ আসতেই ঠাকুর তাঁকে আলিঙ্গন করে স্নেহাসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "তোর জন্যে সন্দেশ এনেছি, তুই খা।" তারপর পরম আদরে তাঁকে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হলে পূর্ণকে নিয়ে তাঁরা মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় যান এবং সেখানে ঠাকুর তাঁকে সাধন সম্পর্কে নানা উপদেশ দেন।

কলকাতায় কোন ভক্ত গৃহে এলে ঠাকুর পূর্ণকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। আবার সুযোগ পেলে কারো হাতে পূর্ণের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। একবার দেবেন্দ্র মজুমদারের হাতে কয়েকটা আম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন পূর্ণকে খাওয়ালে লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়।

একদিন বলরাম-ভবনে পূর্ণকে কাছে বসিয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "স্বপ্নে কি দেখিস?" পূর্ণ বলেছিলেন, "আজ্ঞে, আপনাকে দেখেছি- বসে আছেন, কি বলছেন।" ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, "খুব ভাল। তোর উন্নতি হবে, তোর ওপর আমার টান আছে।"

পূর্ণ ছিলেন ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ। যুগে যুগে তিনি অবতার পুরুষের লীলাসহচর হয়ে এসেছেন। তাই ঠাকুরকে চিনতে তাঁর দেরী হয়নি। ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রায়ই একটা প্রশ্ন করতেন, "আমাকে তোর কি বলে মনে হয়, বল দেখি?" পূর্ণকেও এই প্রশ্নটি করেছিলেন। মনে হয় পূর্ণ তাঁকে প্রথম দর্শনেই চিনেছিলেন। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ভক্তিভরে বলেছিলেন, "আপনি ভগবান, স্বয়ং ঈশ্বর।" নরদেহে ঈশ্বরের পূর্ণ আবির্ভাব চিনতে, বুঝতে পারা সোজা কথা নয়। অথচ বালক পূর্ণ নির্ভুলভাবে তা চিনেছিলেন। ঠাকুর পূর্ণের এই সত্যোপলব্ধিতে যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন, "নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধসাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবত পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

ঠাকুর প্রায়ই মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে পূর্ণের খোঁজখবর নিতেন। একদিন জানতে চাইলেন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে তাঁর কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা। মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, "সে চার-পাঁচ দিন ধরে বলছে, ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে এবং তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে, রোমাঞ্চ এইসব হয়। শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, "খুব বড় আধার। তা না হলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ও তো ঐ সব কথা জানে না।"

দেহত্যাগের পরও ঠাকুর পূর্ণের প্রতি সর্বদাই সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। একবার সিমলায় কর্মরত অবস্থায় পূর্ণের কঠিন অসুখ হয় এবং শরীর খুব জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁর অফিসের একজন কর্মচারী তাঁর রোগকাতর দেহ দেখে বলেছিলেন, ঠাকুর যদি এখন থাকতেন, তাহলে আপনার এই অবস্থায় কি করতেন? কথাটা শুনে পূর্ণ বেশ জোরে বলে উঠলেন, "তিনি গেছেন কোথায়?" তারপর একটু শান্ত হয়ে বলেন, "দেখুন, কাল রাতে প্রস্রাব করতে বারান্দায় কোন রকম দেওয়াল ধরে ধরে গেছলাম, ঘরে অবশ্য লোক থাকে। কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল বলে তাকে আর জাগাই নি। একাই ঐভাবে বারান্দায় যাই। কিন্তু ফেরার সময় উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন।"

ধন্য পূর্ণ! ধন্য ঠাকুরের লীলা!

মহাকবি কালিদাসের অধ্যাত্ম ভাবনা **শ্রী রমেন রায়**

মহাকবি কালিদাস ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূর্ত প্রতীক। হিন্দু দর্শন তথা ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি- আধ্যাত্মিক চিন্তা। এই চিন্তার ফল চিরস্থায়ী। এই চিন্তারই অন্য নাম দার্শনিক চিন্তা। বিশ্ববরেন্য এই কবির রচনায় এই অধ্যাত্ম ভাবনা অতি সুন্দর ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সত্য-শিব ও সুন্দরের পূজারী কবির পারমার্থিক উপলব্ধি এ-যুগের পাঠককেও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে।

কারণমুখী চিন্তাই অধ্যাত্ম চিন্তা। যে ভাব, কর্ম মানুষকে কারণমুখী করে তোলে তাই আধ্যাত্মিকতা। মহাকবির রচনায় এই ভাব ও কর্মের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম জগতে সব চেয়ে বড় কথা হল আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনের উপায়- শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান। কিন্তু প্রশ্ন, এই কর্মত্রয় কাকে কেন্দ্র করে সাধিত হবে? জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য, জ্ঞান, ভালবাসা ও নাম যার ভেতর সহজ-উৎসারিত, আর যার প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সাধন লাভ হয় - তিনিই মানুষের ভগবান। আর এই ভগবানকে জানা মানেই সমস্তটাকে জানা-বুঝা। তাই আমাদের শ্রবণ মনন ধ্যান হবে তাঁকে কেন্দ্র করে- যাঁর কোন মূর্ত আদর্শে কর্মময় অটুট অচ্যুত আসক্তি সময় বা সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান করে তুলেছে - যাঁর কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান মনের ভাল-মন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলোকে ভেদ করে ঐ আদর্শেই সার্থক হয়ে উঠেছে। কেবল সেই তাঁকে জানলেই সেই পুরাণ পুরুষের জ্ঞান হতে পারে। আর এই সনাতন পুরুষকে জানাই, সমস্ত কিছুকে জানা।

অধ্যাত্ম ভাবনার মূল কেন্দ্র দেহ ও আত্মা। দেহ নশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর। মৃতের জন্য শোক অহেতুক। কারণ দেহের মৃত্যু জীবের শৈশব কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যের মতোই একটি অবস্থা। মহারাজ আজ পত্নীবিয়োগে কাতর। বশিষ্ঠ-শিষ্য তাঁকে সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে বলেছেন- হে মহারাজ আপনি ভাবুন, দেহ ও আত্মার সংযোগ বিয়োগ চিরন্তন। সুতরাং পুত্র বা পত্নীর বিয়োগ শোক নিরর্থক। কেন না, আপনিও একদিন এই অবস্থা প্রাপ্ত হবেন, যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন আপনার প্রাণাধিকা প্রেয়সী। (রঘু ৮/৮৯)

মৃতের জন্ম, জাতর জন্ম অনিবার্য। আত্মার ও দেহের সংযোগ জন্ম। আত্মার দেহত্যাগ, তারই নাম মৃত্যু। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। এই আত্মা

নিত্য, অক্ষয়, পরিণামহীন। লোকদেহ বিনষ্ট হলেও এর বিনাশ নেই। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ ধারন করে। (গীতা ২/২০,২২) কালিদাসের বিশিষ্ট-শিষ্য যা বলেছেন, তা আর গীতার এই উক্তি অভিন্ন।

মহারাজ আজ এখনি মৃত্যু বরণ করতে পারেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পত্নীকে পাবেন? মোটেই নয়। কারণ মানুষ কর্মের দাস। মহারাজ পত্নীও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি জন্ম নেবেন কৃত কর্মানুযায়ী। সুতরাং কারো শোকে বিহ্বল হওয়া উচিত নয়। পরলোকে স্ব-কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। এবং সেই জন্যই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে গমন করে। (রঘু ৮/৮৫)

আত্মা অবিনাশী, নিত্য। এই জ্ঞানের অভাবই দুঃখের কারণ। দুঃখ কী? দুঃখ একরকম ভাব। 'অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ।' মানুষ জগতের হাজার কর্ম করেও দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু পারবে কেবল তখন-যখন তার হৃদয়ে অভাবের ভাবটা থাকবে না। এই অভাবের ভাবটা যাও বললে যায় না। তাকে তাড়িয়ে দিতে হয়। তার জন্য শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের সে-সাধনা তো নেই, তাই, তারা এত শোক বিহ্বল। বশিষ্ঠ-শিষ্য যথার্থ বলেছেন- অজ্ঞানীরা প্রিয়জনের মৃত্যুকে শেল নিক্ষেপ বলে মনে করে। কিন্তু স্থির তথা স্থির বুদ্ধিরা তা করেন না। তারা বরং প্রিয়জনের মৃত্যুকে মোক্ষ সাধনের উপায় বলে মনে করেন। (রঘু ৮/৩৮)

এই সংসার দুঃখময়। এই জন্য, যে, এই সংসার কামনা বাসনা পূর্ণ। মানব জীবন পুষ্পশয্যা নয়। আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রকম দুঃখের দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ। দুঃখ ভোগ করেনি এমন প্রাণী জগতে বিরল। কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন-দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (শৃঙ্গার তিলক ৩/১০)

সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম কবি বেদান্তের অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষকে নীলকন্ঠ মহাদেব রূপে চিত্রিত করেছেন। এই মহাদেব স্বর্গ, পৃথিবী, মর্ত্যাদি সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান। ইনিই নশ্চৈর। তাঁকেই লাভের জন্য লালায়িত মোক্ষার্থীরা। ইনি ভক্তির কাঙাল। দৃঢ় ভক্তির দ্বারা লভ্য। (বিক্রমোবর্শীয় ১/১)

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের প্রস্তাবনায় এই মহাদেবই জল, অগ্নি, যজমান, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু- এই প্রত্যক্ষ অষ্ট মূর্তির দ্বারা অনুমিত। যোগীরা তাঁকেই আরাধনা করেন। সমস্ত প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা স্বরূপ। যোগীরা যাঁকে ধ্যানের দ্বারা নিরন্তর চিন্তার দ্বারা জানবার প্রয়াসী ইনি সেই। তাঁর চরণ লাভ মানেই পুনর্জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি। মনীষীরা তাই বলেন।
(কুমার সম্ভব ৬/২৭)

উপনিষদ হল সেই বিদ্যা, যা অর্জন করতে পারলে সেই পুরাণ পুরুষে উপনীত হওয়া যায়, যাঁর থেকে ভূত বা প্রাণী সমূহের জন্ম, যার দ্বারা প্রাণী জীবন ধারণ করে। এই পুরাণ পুরুষই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ইনি আর ব্রহ্ম অভিন্ন। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/১/১)

ব্রহ্ম কী? 'যাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাহা কিছু হইয়া তাহাই আছে – তাহাই ব্রহ্ম।।' এই ব্রহ্মের হ্রাস নেই বৃদ্ধি নেই। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে রজ্জুর হ্রাসও হয় না বৃদ্ধিও হয় না। ব্রহ্মও তদ্রূপ। ব্রহ্ম থেকে সবকিছু জাত, আবার সব কিছু ব্রহ্মেই লীন। এতে ব্রহ্মের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তিনি যা ছিলেন, তাই আছেন। এবং তাই থাকবেন। এই ব্রহ্মস্তুতি মহাকবিও করেছেন-হে অনাদি পুরুষ, আপনি অজ, আপনিই জলগর্ভে অব্যর্থ বীজ নিহিত করেন। আর তা থেকেই চরাচর বিশ্বের আবির্ভাব। এবং সেইজন্যই আপনি সব কিছুর জনক বা আদি বলে অভিহিত। আপনিই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। (কুমার সম্ভব ২/৫/৬)। ইনি সর্বজ্ঞ। তাঁর স্বরূপ সকলের অবোধগম্য। অনুরূপ উক্তি তাঁর সাহিত্যে বহুলভাবে বিদ্যমান।

বেদান্তের পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন। প্রকৃতির অন্য নাম মায়া। মায়া ত্রিগুণাত্মক, অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মিশ্রণ। সত্বগুণ ইষ্টভাব, রজোগুণ আসক্তি আর তমোগুণ হল অজ্ঞান। জীব এই তিনগুণে তৈরী। বেদান্তের এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ব মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে আছে। তোমাকেই (শিবকেই) পুরুষের প্রয়োজন সাধন করা প্রকৃতি বলা হয়। এবং তোমাকেই সেই প্রকৃতির সাক্ষী নিত্য পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়। (কুমার সম্ভব ২/১৩)। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হলেও ত্রিগুণাত্মক মায়ার কারণে – ব্রহ্ম ত্রিমূর্তি ধারণ করেন। আর সেইজন্য তিনি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (কুমার সম্ভব ২/৪)

গীতায় ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের কথা আছে। ক্ষর ব্রহ্ম বিনাশী। অক্ষর অবিনাশী। কালিদাসের লক্ষ্য এই অক্ষর ব্রহ্মই। কালিদাসের এই অক্ষর ব্রহ্মই ক্ষর ব্রহ্ম তথা অষ্ট মূর্তিরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর এই আবির্ভাব নিজের জন্য নয়, স্বার্থশূন্য হয়েই তিনি আবির্ভূত হন। অর্থাৎ ভক্ত বা সাধনার কল্যাণ সাধনই তাঁর উদ্দেশ্য।

মহাকবি জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী। স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতী অজকে স্বামীরূপে বরণ করেন, যদিও অন্যান্য যুবরাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহাকবি বলতে চেয়েছেন জন্মান্তরের সম্বন্ধের জন্যই ইন্দুমতী অজকে বরণ করলেন। (রঘু ৭/১৫)। প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র সীতাকে (যদিও অগ্নি পরিশুদ্ধা) বনবাস দিয়েছিলেন। সীতা দেবী এই ভাগ্য বিপর্যয়কে কিন্তু জন্মান্তরীন পাপের ফল হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। (রঘু ১৪/৬২)

চিত্তশুদ্ধি না হলে অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ সম্ভব নয়। সদ্‌গুরু তথা ব্রহ্মজ্ঞও পুরুষের নির্দেশে চললে চিত্তশুদ্ধি হয়। যোগ শাস্ত্রেও চিত্তশুদ্ধির উপায়ের নির্দেশ আছে। কালিদাস এই চিত্ত বিশুদ্ধতার ওপরও জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রয়াগ তীর্থে স্নান করে বিশুদ্ধ চিত্তে দেহত্যাগ করলে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব থাকলেও পুনর্বার জন্মগ্রহণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। (রঘু ১৩/৫৮)

জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষ তথা পুনর্জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের সমাপ্তিতেও সেকথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

সর্বশেষ বলা যায়, মহাকবি কালিদাসের অধ্যাত্ম ভাবনা তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর সবাইয়ের মত তিনিও সেই একে বিলীন হওয়ার পক্ষপাতী - যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। শ্রুতির ভাষায়-

ন স পুনরাবর্ত্ততে নস পুনরাবর্ত্ততে।
ইমং মানবং আবর্ত্তং নাবর্ত্ততে নাবর্ত্ততে।।

মৃত্যুভয় - The Fear of Death

শ্রীঅরবিন্দ

বিচরণ করে মৃত্যু ধরার জীবনে স্বেচ্ছা মত,
মধুর মৃত্যু প্রতি নিঃশ্বাসে করে তার অনুগত,
কেন ভয় করো? ওই দেখো তার হসিত আননখানি,
কৌতুকময়ী, গোলাপী আভায় দীপ্তা রূপের রাণী,
নম্র-হৃদয়া মনোরমা বালা, পুষ্প চয়ন করে,
যেথা শোভাময় কুসুম কাননে বসন্ত ঝরি পড়ে,
ভয় কর তুমি সুকুমার তনু এই প্রতিহারিনীরে।
সে যে খুলে দেয় আত্মার তরে আলোকের দ্বারটিরে।
দলিত পৃষ্ট কুসুমবৃন্ত বেদনে আহত হয়
তুলিলে পুষ্প, তাই কি তোমার মরণে এতই ভয়?
পুষ্পবিহীন শাখার দীনতা লাগেনা তোমার ভালো,
সেই কারণেই মৃত্যুর মাঝে দেখ তুমি শুধু কালো?
অথবা মরণ খোলে যবে দ্বার কর্কশ ধ্বনি সনে,
দুর্বল হিয়া কাঁপে কি তোমার শঙ্কা জাগে কি মনে?
মৃত্যু যে শুধু পরিধান ত্যাগ নূতন জীবন তরে
প্রস্তুতি চলে নবীন বস্ত্রে পরম বাসর ঘরে।।

শ্মশানবাসিনী শ্যামা

শ্রী শান্তশীল দাশ

শ্মশানবাসিনী শ্যামা,
ও রূপ তোমার ভয়ংকরী
লুকাও মাগো, কী ভয় যে পাই,
সম্বর মা কৃপা করি।
হাতে কৃপাণ রক্তমাখা,
পতির বুকে চরণ আঁকা,
মুণ্ডমালা বিভূষিতা
কী ভীষণা তুই শঙ্করী!
মায়ের মতন রূপটি ধরে
আয় মা আমার সমুখ পানে,

DO NOT COPY

নয়ন ভরে দেখবো ও রূপ
করবো পূজা গানে গানে।
আমার আঁধার আমার আলো,
আমার মন্দ, আমার ভাল,
সকলই মা ওই চরণে
সাজিয়ে দেব ডালায় ভরি।

গর্ভধারিনী **শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য**

গর্ভে তুমি ধারণ করেছো
তাইতো গর্ভধারিনী
জনম দিয়েছো সন্তানে
তাই তুমি জননী।
তোমার কোলে দুনিয়া দেখেছি
খেয়েছি বুকের সুধা,
বলতে হয়নি দৌড়ে এসেছো
যখনই পেয়েছে ক্ষুধা!
যখন যা দরকার মাগো
সব পেয়েছি তোমার কাছে
তারতো কিছুর অভাব নেই
কাছে যার মা আছে!
আঙ্গুল ধরে চলতে শেখালে
এই পৃথিবীতে তুমি।
তোমার স্নেহ ভালবাসায়
পুষ্ট আমার দেহ
মন যে আমার সদা লালায়িত
পেতে মাতৃস্নেহ!
কোন দেশেতে গেলে মাগো
ছেড়ে দিয়ে একা
সদা তোমার আশীষ যেন পাই
না যদি পাই দেখা।

DO NOT COPY

রক্তের দাগ **সুনন্দন ঘোষ**

গুমনামী বাবা নেতাজী কিনা আজও জানি না।
পুরীর মন্দির থেকে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল কি
গৌর গোঁসাইয়ের?
তাও জানি না।

বছর আসে, বছর যায় !!!
শাসকের লেখানো ইতিহাস ভূগোল কণ্ঠস্থ করতে করতে
আমরা এখন প্রশ্নও করিনা, উত্তরও খুঁজি না।

দেড় বছর ধরে শিক্ষকতার দাবীদাররা
বসে আছে মহানগরের পথের ধুলোয়।
ওদের পেটের আগুন থেকে জ্বলছে মনের আগুন।

উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে নিরাপদে আছি ... ।
বঞ্চনার খবর শুনি না,
নির্যাতনের খবর দেখি না।
কলার ধরে ডাকাতবাবুদের বলতে পারিনা –
অনেক লুটেছ! এবার ওদের সম্মান ফিরিয়ে দাও!

জ্বলছে ময়ূর সিংহাসন।
সাদা শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে রক্তের ঢেউ।
সাদা হাওয়াই মাড়িয়ে যাচ্ছে চোখের জল।

রক্তের দাগ মোছে না।
ইতিহাস বিক্রি হয় না।

DO NOT COPY